হৃদয়বান, তাই রামকিঙ্কর জীবনশিল্পী

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

এস.এস.কে.এম. হাসপাতালের শিক্ষক রামকিঙ্করকে নিয়ে এসেছেন শিল্পী প্রভাস সেন ১৯৮০ সালের ২৩ মার্চ। ভর্তি করলেন উডবার্ন ওয়ার্ডে। কাগজ কলমে রোগীর বয়েস ৭০ বছর। কিন্তু ডাক্তারের মনে হল বয়েস আরো বছর পাঁচেক বেশি। ডাক্তার বললেন, ঠিক করে বলুন, না হলে চিকিৎসার অসুবিধে হবে। রামকিঙ্কর হেসে বললেন, আমার জন্ম ১৯২৫ সালে। আমি ঐ বছর শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম। ডাক্তার হেসে উঠলেন। প্রকৃতপক্ষে শান্তিনিকেতনের সৃষ্টিশীল জীবন তাঁর নবজীবনের এক ঐতিহাসিক প্রারম্ভ।

চিকিৎসক আর ছাত্র - শুভানুধ্যায়ীদের শুশ্রূষা -সেবা ভালোবাসার মধ্যে ২ আগস্ট ১৯৮০ রাত সাড়ে বারোটায় তাঁদের সকলের কিঙ্করদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কাচের গাড়িতে শান্তিনিকেতনের পথে শেষ যাত্রা। রতনপল্লীর শ্মশানে তাঁর দেহ আকৈশোরলালিত পল্লীপ্রকৃতিতে বিলীন হল।

বাঁকুড়ার যুগীপাড়ায় রামকিঙ্করের জন্ম ২৫মে ১৯৬০ এক বিত্তহীন ক্ষৌরকার পরিবারে। বাবা চণ্ডীচরণ প্রামাণিক, মা সম্পূর্ণাদেবী। দুই ভাই চার বোন আর তাদের মা-কে নিয়ে চণ্ডীচরণের সংসার। রামকিঙ্করের বাড়ির কাছেই সূত্রধর পল্লী। এখানকার মানুষ জাতশিল্পী। বালক বয়েস থেকেই রামকিঙ্কর এক সঙ্গে আঁকা ও ভাস্কর্যের কাজ শুরু করেন। স্বশিক্ষিত রামকিঙ্করের শিল্প গুরু হলেন অনন্ত সূত্রধর। শিল্পকর্মে রামকিঙ্করের প্রথম প্রেরণা বিষ্ণুপুরের নানা মন্দিরের পোড়ামাটির স্থাপত্যকে অনুসরণ করা। একই সময়ে বাঁকুড়ার আর এক বয়স্ক শিল্পী এই কাজ করেছেন, তিনি যামিনী রায়। তরুণ ও প্রচীন শিল্পীর আকস্মিক সাক্ষাৎকার ঘটল। এই অভাবিত সংস্পর্শ কি উত্তরজীবনে রামকিঙ্করের শিল্পসাধনার নান্দীপাঠ! অনিলবরণ রায় ছিলেন সে-সময়ের জাতীয়তাবাদী নেতা, তাঁর উৎসাহে রামকিঙ্কর অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হন। গান্ধিজী, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ ছবি আঁকেন সে - সময়ে।

পথের ধারে বসে রামকিঙ্কর কাপড়ের উপর নাটকের সিন-ও আঁকতেন। এরকম একদিন তাঁর উপর চোখ পড়ল প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি রামকিঙ্করের তুলির আঁচড়ে ভবিষ্যতের এক দক্ষ শিল্পীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৯২৫ সালে রামানন্দ তাঁকে শান্তিনিকেতন নিয়ে এসে শিল্পী নন্দলালের কাছে সমর্পণ করলেন। নিজের আঁকা কয়েকটি ছবি সঙ্গে এনেছিলেন রামকিঙ্কর। সেগুলি দেখে নন্দলাল বললেন– তুমি তো সবই জানো, আবার এখানে কেন? এসেছ যখন, থাকো দু'তিন বছর।

সত্যিই কি রামকিঙ্কর সবই জানতেন! গুরুর সান্নিধ্যে ক্রমে তিনি রেখাচিত্র ও ভাস্কর্যে এক অন্যন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তাঁর শিল্পকর্মে রাঢ় বাঙলার বলিষ্ঠ প্রকৃতিই শুধু মূর্ত হল তাই নয়, শান্তিনিকেতনের কলাবিদদের সংস্পর্শে তাঁর কাজে পশ্চিমের প্রত্যক্ষতা ও প্রাচ্যের বিমূর্ততা মিলে এক অসাধারণ সৌন্দর্যের জন্ম হল। বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য কলা ভবনের শিক্ষাক্রমের সঙ্গে তখন প্রতি বছর দেশভ্রমণের -ও রীতি ছিল। এই ভ্রমণে রামকিঙ্কর ঘুরেছেন ঘুরেছেন নালন্দা, রাজ গৃহ গয়া, বুদ্ধগয়া। এই ভাবে তাঁর ভারতের প্রাচীন যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। শীতের রাতে একবার দিল্লীর ধর্মশালায় উঠতে হল। ঘর - বারান্দা - চাতাল সর্বত্র যাত্রীতে ভর্তি। তারা খোলা জায়গায় আগুন পোহাচ্ছে। দেয়ালে একটি আলমারিতে কাঠের পাল্লা। খুলে দেখেন তিনটি পাথরের তাক। সেখানেই রাত্রি যাপন। রামকিঙ্কর পশ্চিমী ধারায় মূর্তি গড়ার পাঠ নিয়েছেন মিস পট, মার্গারেট মিলওয়ার্ড প্রমুখ শিল্পীর সান্নিধ্যে। এঁদের কাছ থেকেই তিনি প্রাণিত হয়েছিলেন রোঁদার অসাধারণ ভাস্কর্যে। অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জেনেছি শিল্পী প্রবাস সেন রামকিঙ্করের কিছু ছবি আর মূর্তির প্রতিলিপি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ফ্রান্সে। নানা প্রদর্শনীতে পিকাসো, মাতিস প্রমুখ ভুবনখ্যাত শিল্পীর নানা শিল্পকর্মের সঙ্গে দেখানো হয়েছে রামকিঙ্করের কাজের প্রতিলিপি-ও। সে - দেশের শিল্পীরা রামকিঙ্করের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

।। দুই।।

মাঝখানে দীর্ঘ দিন কেটে গেছে কখনো কখনো আমি শান্তিনিকেতন যাই। সারাদিন ঘুরে ঘুরে রবীন্দ্রনাথের নানা স্মৃতি ক্যামেরা বন্দি করি। কলাভবন প্রাঙ্গণে রামকিঙ্করের বিখ্যাত ভাস্কর্য সাঁওতাল পরিবার, হাটের পথে, সুজাতা, ধানঝাড়া। ধানঝাড়া ভাস্কর্যটিকে কেউ কেউ নাম দিয়েছেন 'শ্রম'। গোয়েঙ্কালয়ের পাশে গান্ধীজী, কৃষি অর্থনীতি কেন্দ্রে ভিস্তিওয়ালা, এ-সবই আমার ফটোগ্রাফির অন্যতম আকর্ষণ ছিল। 'সুজাতা' ভাস্কর্যটি ১৯৫৩ -এ তৈরি। ইদানীং তার শরীর থেকে ঝরে যাচ্ছিল কংক্রিট আর খোয়াই - কাঁকরের আস্তরণ। ২০০৬-এর পরিচর্যায় তার পুরোনো সমৃদ্ধি কিছুটা ফিরেছে। সুজাতার পিছনে নানা বৃক্ষের অরণ্য। আর ঠিক দক্ষিণে একটি বড় শালগাছ। সুজাতা যেন এই গাছেরই এক নৈসার্গিক প্রতিবেশী। পথের ধারে 'সাঁওতাল পরিবার' -এর নির্মাণ চলছে তখন। পথিক সাঁওতালরা বলল — বাবু এটা কি করেছিস? এতো বড় মানুষের জন্য এতো ছোট একটা তালাই! শোবে কি

করে? পরে রামকিঙ্কর তালাই আরো বড়ো করে দেন। কলাভবনের প্রাঙ্গণে সাঁওতাল পরিবার প্রমুখ যে উদ্যান - ভাস্কর্যগুলির আলোকচিত্র আমার সযত্ন সংগ্রহে রক্ষিত, তাদের মাথার উপরে কিছু গাছের ডালপালা আর উন্মুক্ত আকাশ। এখন সেগুলির উপর টালির চালের আচ্ছাদন। এ-ব্যবস্থা যে বীরভূমের ফাঁকা জায়গায় রোদ -বৃষ্টি-ঝড় থেকে শিল্পকর্মগুলিকে রক্ষার জন্য, এই ভাবনা কিছুটা স্বস্তি দেয়।

দক্ষিণ গুরুপল্লীতে হাতিপুকুর। তার ধারে একটি হাতির ভাস্কর্য। তার শুঁড়ে ধরা এক শিশু, শিশুর হাতে একটি বল। এই ভাস্কর্যটিও কংক্রিট ও খোয়াই কাঁকরের সংমিশ্রণে তৈরী। এই শিল্পকর্মে কোথাও যেন একটি অসম্পূর্ণতা! রামকিঙ্করের কোনো ভাস্কর্যেই তাঁর নাম খোদাই করা নেই। কাজেই সংশয় নিরসনের জন্য সোমেনদা'র শরণ নিলাম। উনি বললেন ভাস্কর্যটি আসলে কলাভবনের অরুণাচল পেরুমলের তৈরী। রামকিঙ্কর মাঝে মাঝে গিয়ে পরামর্শ দিয়ে আসতেন। এই মূর্তিটি নিয়ে এ-অঞ্চলে একটি জনশ্রুতি আছে। স্নানরতা মায়ের অসতর্কতায় তাঁর শিশুপুত্রটি জলে পড়ে যায়। তখন একটি হাতি তাকে জল থেকে উদ্ধার করে। সে-ক্ষেত্রে শিশুর হাতের বলটি মোটেই বাস্তবানুগ নয়। সোমেনদা-ও উক্ত জনশ্রুতিকে নেহাৎই কল্পনা বলে উড়িয়ে দিলেন।

আমি কোনো শিল্পকর্মের দূরতম বিশ্লেষক-ও নই। কিন্তু বহুবার দেখা ভিস্তিওয়ালার ভাস্কর্য থেকে যখন দেখি উপাদানগুলি ঝরে যাচ্ছে, এবং ভিস্তিওয়ালা ক্রমে ন্যুব্জ হয়ে পড়ছে, তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না রামকিঙ্করের প্রয়াণের তিন দশকের মধ্যেই শান্তিনিকেতন তাঁকে ভুলতে শুরু করেছে।

রবীন্দ্রনাথ শেষযাত্রার আগে প্রতিমাদেবীকে বলেছিলেন, 'মা-মণি' আমি ক্রমশই নেমে যাচ্ছি, বুঝতে পারছি এ ব্যামোর হাত এড়াতে পারব না।...তোমরা সংসার গুছিয়ে বসেছ। আমি নিশ্চিন্ত, আর রইল এই ল্যাবরেটারি (শান্তিনিকেতন), একে তোমরা বাঁচিয়ে রেখো। আমি বারবার শান্তিনিকেতন গিয়ে দেখেছি এখানকার প্রতিনিধিরা কি ভাবে শান্তিনিকেতন তথা রবীন্দ্রনাথকে বাঁচিয়ে রেখেছেন! মানুষের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের অনেক কাহিনী আমার সঞ্চয়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার প্রিয়পাত্র রামকিঙ্করের প্রতিও শ্রদ্ধা যে তলানিতে এসে ঠেকেছে, তার অন্যতম নিদর্শন বিধ্বস্ত ভিস্তিওয়ালা। এক জন সৃষ্টি করে, বাকিরা তাকে ধ্বংস করে আনন্দ পায়।

শিল্পী মানুষ যে জনজীবনের সঙ্গে এতো ওতপ্রোত জড়িয়ে তা রামকিঙ্করের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি থেকে যেমন জেনেছি, তেমনি আমার বন্ধু শান্তিনিকেতনের সুখেন্দুকৃষ্ণ মজুমদারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে।

শান্তিনিকেতন, পুরোনো গেস্ট হাউসের সামনে রামকিঙ্করের তৈরী যে বিমূর্ত স্থাপত্য, তার অন্তর্নিহিত অর্থ বহুবার দেখেও আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। রামকিঙ্করের জন্ম শতবার্ষিকী গ্রন্থে তাকে বলা হয়েছে ''Lamp Stand''। এ-বিষয়ে রামকিঙ্গরের একটি ব্যাখ্যা শুনেছি সুখেন্দুর মাধ্যমে। একদিন প্রাতঃভ্রমণে এই ভাস্কর্যের কাছে সুখেন্দুর দেখা রামকিঙ্করের সঙ্গে। ও সংকোচে শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করল— কিঙ্করদা, আপনার এই স্থাপত্যটির অর্থ যদি একটু বুঝিয়ে বলেন। উনি বললেন—তুই কখনো ক্লাসিক্যাল গান শুনেছিস! সেই গানে কোনো কোন কথা নেই। সুর আছে। যদি বলি এটা একটি সুর, তুই মানবি? সুখেন্দু শ্রদ্ধার সঙ্গে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করল। আমারও মনে হল এটাই যথার্থ উপলব্ধি।

শান্তিনিকেতন গেলে অন্য অসংখ্য স্মৃতিচারণ যেমন আমাকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি চলে আসেন রামকিঙ্কর-ও। একবার রতনকুঠির পাশের রাস্তা ধরে আমি ও সুখেন্দু রামকিঙ্করের একদা - বসবাসের জায়গাটিকে দেখতে যাচ্ছি, এবং সেই সঙ্গে রতনপল্লীর শ্মশানটিও দেখার বাসনা। এই শ্মশানেই তাঁকে দাহ করা হয়েছিল।

পথের ধারে একটি সুসজ্জিত পাকা বাড়ি। তার প্রবেশ পথে লেখা 'কিঙ্কর/সরকার/শান্তিনিকেতন'। 'সরকার' বর্তমান গৃহকর্তার আত্মপরিচয়। এই বাড়িটির পূর্ব চেহারা একটি আটচালা খড়ের বাড়ি। বাড়িটি ছিল শিল্পী শঙ্খ চৌধুরীর। এখানেই ছিলেন রামকিঙ্কর। রাধারানী কয়েকটি পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এখানে। বাড়িটি ক্রমে জীর্ণ হয়ে পড়ছিল। বর্ষায় চাল দিয়ে জল পড়ছে। রামকিঙ্কর জল আটকাতে খাটিয়ার নিচে থেকে তাঁর আঁকা কয়েকটি ছবি তুলে নিয়ে মশারীর উপরে বিছিয়ে দিলেন। এমনি করে যে তাঁর কত অমূল্য সৃষ্টি অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, তার কোনো ইতিহাস নেই।

গৃহকর্তা খড়ের বাড়ির পরিবর্তে একটি পাকা বাড়ি করতে চাইলে রামকিঙ্কর এন্ড্রুজ পল্লীতে বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের জন্য নির্দিষ্ট একটি বাড়িতে উঠে যান। তিনি মাঝে মাঝেই বলতেন, ফেলে আসা বাড়িটির কথা মনে হয়। পরে তিনি ওই একই পল্লীতে অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী হয়ে যান। এই পাড়ায় 'আনন্দধারা' অনন্য সঙ্গীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। প্রতিবেশী হিসেবে সোমেন্দ্রনাথের সঙ্গে রামকিঙ্করের এই নৈকট্যে প্রতিভাধর ভাস্কর ও আত্মভোলা মানুষটি যে অকাত্ম হয়ে গেছেন তা সোমেন্দ্রনাথের 'শিল্পী রামকিঙ্কর আলাপচারি' গ্রন্থে গভীর আন্তরিকতায় বিম্বিত। শিল্পীকে তাঁর সমগ্রতা নিয়ে তুলে ধরতে সোমেন্দ্রনাথ দীর্ঘ এক বৎসরকাল প্রত্যেক ছুটির দিনে সকাল - দুপুর - সন্ধ্যে তাঁর সঙ্গে অক্লান্ত আলাপচারিতায় মগ্ন থেকেছেন। তাঁর জীবনকাহিনীর মধ্যে প্রাপ্তির শেষ ছিল না। কিন্তু রামকিঙ্করের দেহে গোধুলির ছায়া ঘনিয়ে আসছিল। চিকিৎসার জন্য তাঁর প্রাণের শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় মহাযাত্রা। অবশেষে ফুলে ঢাকা তাঁর মরদেহ ২ আগষ্ট ১৯৮০-র

বৃষ্টিমেদুর রাতে ফিরে এল শান্তিনিকেতনে। সোমেন্দ্রনাথের 'শিল্পী রামকিঙ্কর আলাপচারি' প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৯৯৪ -এ। মুদ্রিত বইটি রামকিঙ্করের হাতে তুলে দেয়ার সাধ অপূর্ণ থেকে যায় সোমেন্দ্রনাথের।

রামকিঙ্করের শিল্পকর্মের সন্ধানে উৎসাহী মানুষকে কেবল শান্তিনিকেতন যেতে হবে কেন! সুদূর হাঙ্গেরিতে ওঁর তৈরী রবীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ মূর্তি আছে। শিল্পী প্রভাস সেনের উদ্যোগে রামকিঙ্করের শিল্পকর্ম ফ্রান্সে নানা শিল্প প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হলেও কোথাও তাঁর ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে শুনিনি। দেবীপ্রসাদের ভাস্কর্য ভারতবর্ষের নানা শহরে প্রতিষ্ঠিত। রামকিঙ্করের যক্ষ ও যক্ষিনীর মূর্তি দেখেছি দিল্লীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রবেশ দ্বারে। বলিষ্ঠ কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেউ কেউ একে দুঃস্বপ্ন বলেছেন। এক রাতে আমি প্যাটেল চকের এক সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে পথ হারিয়ে ফেলি। নির্জন পথে হঠাৎ আমি যক্ষযুগলের মুখোমুখি। ওদের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বার হচ্ছে। পরিবেশ আমাকে কিঞ্চিৎ ভীত করেছিল, কিন্তু তাৎক্ষণিক বিভ্রম কাটিয়ে এই শিল্পকর্মকে আমি খুঁটিয়ে দেখি, এবং তা আমার দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়নি।

প্রখ্যাত কলাশিল্পি ঐতিহাসিক অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে রামকিঙ্কর টালির উপরে খোদাই করে অজন্তার দুটি হাঁসের মূর্তি এঁকেছিলেন। সেগুলি স্থাপিত হয় অর্ধেন্দুবাবুর এলগিন রোডের বাড়িতে সদর দরজার মাথায়। কিন্তু বিজ্ঞাপনের অসৌজন্যে ঢাকা পড়ে তা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়নি। রামকিঙ্করের আর একটি কাজ আছে কলকাতার রবীন্দ্রসদনে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নীচে, আধো অন্ধকারে, এটি রবীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ বিষণ্ণ মূর্তি। এগুলি গবেষকদের খুঁজে বার করতে হয়। কেবল সল্টলেকের বিদ্যুৎভবনের মাঠে রামকিঙ্করের প্রখ্যাত ভাস্কর্য 'হাটের পথে'-র রেপ্লিকা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। রামকিঙ্করকে শান্তিনিকেতনে সীমাবদ্ধ রাখার ক্ষোভ কিছুটা হলেও মিটিয়েছে বিদ্যুৎ ভবন।

আমি শিল্পী নই, তবু মেঘ - সূর্যে প্রলিপ্ত রামকিঙ্করের যেখানে যে-টুকু পেয়েছি, বুভুক্ষুর মতো আমি তা গ্রহণ করেছি। তাঁকে তো আমি কাছ থেকে দেখিনি! তাঁর অন্তরঙ্গ মানুষদের এতো স্মৃতি আমি ছাতিম - সেগুনের গন্ধে মুড়ে তুলে এনেছি বছরের পর বছর, তা এই সীমিত পরিসরে উদভাসিত করা যাবেনা। কলকাতার এস.এস.কে.এম. হাসপাতালে তাঁর শেষ দিনগুলির যে-বিবরণ তাঁর আপনজনদের লেখায় পেয়েছি, তা এক মহান শিল্পীকে ছাপিয়ে আত্মভোলা এক আত্মজনকে আমি চলমান মানুষের মতই প্রত্যক্ষ করি।

হাসপাতালে রোগশয্যায় ওঁর কাছে নানা মানুষ আসত। তার মধ্যে শিল্পী শুভানুধ্যায়ী যেমন ছিলেন, তেমনি কেউ কেউ চাকরির প্রত্যাশায় সার্টিফিকেট নিতেও আসতেন। একজন তো সার্টিফিকেট টাইপ করে এনে ওঁকে সই করে দিতে বলল। রামকিঙ্কর বললেন, এতটাই যদি করলে, সইটাও তুমি করে দাও!

এক দর্শনার্থী এসেছেন ঝোলাভর্তি নানা ফল নিয়ে। কিন্তু রামকিঙ্করের তো ফল খাওয়া নিষেধ। দর্শনার্থীকে বলা হল—আপনি ওটা ফিরিয়ে নিয়ে যান। রামকিঙ্কর বলে উঠলেন —না, না, ওটা থাক। ভদ্রলোক ফলগুলি রেখে চলে গেলেন। শুচিব্রত দেব লিখছেন—'দর্শনার্থী চলে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ফল খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে, তা বলেননি কেন? কিঙ্করদা বললেন— আরে, আমার জন্য নয়। তুমি রোজ অফিস ফেরৎ আসো, আজ বেশ ভালো ফল এনেছে, তুমি খাও। আমার চোখ ছলছল করে উঠল!'

হৃদয়বান মানুষ বলেই তিনি সর্বসাধারণের কিঙ্করদা, হৃদয়বান বলেই তিনি অসাধারণ জীবন শিল্পী!

তথ্য-ঋণঃ

১. শিল্পী রামকিঙ্কর আলাপচারি : সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দে'জ)

২. রামকিঙ্কর জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ : বিশ্ববারতী

৩. 'Ramkinkar Baij Centenary Exhitition ঃ বিশ্বভারতী

৪. সুখেন্দুকৃষ্ণ মজুমদারের প্রত্যক্ষ স্মৃতি